আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের দশটি উপায়

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

সকল প্রশংসা আল্লাহর আর তিনিই যথেষ্ট। সালাত ও সালাম মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর, তাঁর পরিবার বর্গ ও সাহাবীদের উপর আর যে তাঁর হেদায়াত অনুসরণ করে তাঁর উপর। হে আল্লাহ নিশ্চয়ই আমি আপনার মহব্বত প্রার্থনা করছি আর এমন জ্ঞান যা আমাদেরকে আপনার ভালবাসা অর্জনের যোগ্য করে দেয়। আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূল (সাঃ)-এর উপর সালাত ও সালামের পরঃ

ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) স্ব স্ব সহীহ গ্রন্থে *হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে রেওয়াত করেন। তিনি বলেন, আমি এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যখন মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম তখন মসজিদের দরজার কাছে একব্যক্তি আমাদের সাথে সাক্ষাত করে। তখন সে ব্যক্তিটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল কিয়ামত হবে কবে? রাসূল (সাঃ) বললেন, এর জন্য তুমি কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো? বর্ণনাকারী বলেন (এ প্রশ্ন শুনে) লোকটি যেন একটু দুর্বল হয়ে গেল। অতঃপর সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সে দিনের জন্য আমি বেশী নামায, রোযা ও সাদকার প্রস্তুতি নিতে পারিনি। কিন্তু আমি নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) কে ভালবাসি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি যাকে ভালবাস তাঁর সাথে থাকবে। হযরত আনাস (রাঃ) এর বর্ণনায় আছে যে 'আর নিশ্চয়ই তুমি যাকে ভালবাস তাঁর সাথে থাকবে' রাসূল (সাঃ)-এর এ কথাটিতে আমরা যেরূপ খুশী হয়েছিলাম ইসলাম গ্রহণের পর অন্য কিছুতে এরূপ খুশী হইনি। সহীহ মুসলিম গ্রন্থে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সাঃ) ও আবু বকর (রাঃ) কে ভালবাসি। তাই আশা পোষণ করি যে আমি তাঁদের সাথে থাকবো যদিও তাঁর সমতুল্য করি নি।*

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) মহব্বত প্রসঙ্গে বলেন, ইহা এমন একটি মর্যাদা যা লাভের আশায় প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করে থাকে, আর নেক আমল যারা করতে চায় তারা সদা সচেষ্ট থাকে। পূর্ববর্তীগণ ইহার জ্ঞান অর্জনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন; আর প্রেমিকরা ইহার জন্য সবকিছু বিলিয়ে দিয়েছেন। ইহার সুগন্ধী বাতাসে ইবাদতকারীরা বিচরণ করে থাকে। ইহা অন্তর সমূহের খোরাক। ইহা আত্মাসমূহের খাবার। ইহা চক্ষুসমূহের শীতলকারী। ইহা এমনই জীবন যে কেহ ইহা থেকে বঞ্চিত হয় সে মৃতদের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহা এমনই আলো যে ইহাকে হারিয়ে ফেলে- সে অন্ধকারের সমুদ্রে নিপতিত হয়। ইহা এমনই আরোগ্য যে ইহা থেকে মাহরুম হয় তার অন্তর সকল প্রকার রোগ-ব্যাধির আস্তানা হয়ে যায়। ইহা এমনই স্বাদ যে ইহা লাভ করতে পারে নি তার পুরো জীবনই বিষাদময় ও ভাবনাময় হয়ে পড়ে।

আল্লাহর শপথ মহব্বতের অধিকারীরা দুনিয়া ও আখেরাতের সম্মান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের মাহবুবের সান্নিধ্যের পুরো হিস্‌সা ও গুণাবলী তাঁদের মাঝে ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

সুতরাং যে আল্লাহকে মহব্বতকারীর মর্যাদা থেকে আল্লাহর মাহবুব হওয়ার মর্যাদায় উন্নিত হতে চায় তাঁর জন্য আমি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহকারে এমন দশটি উপায়ে পেশ করছি যে গুলো ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "মাদারিজুস সালিকীন"-এ উল্লেখ করেছেন।

একঃ আল-কুরআনের অর্থ বুঝে, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় জেনে গভীর মনোনিবেশ সহকারে তেলাওয়াত করা। কেউ কোন বই মুখস্ত করতে চাইলে ইহার অর্থের দিকে চিন্তা করে আর বইটিকে এভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে যাতে এর রচয়িতার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।

হ্যাঁ, কেউ আল্লাহর সাথে কথা বলতে চাইলে সে যেন আল্লাহ্‌র কিতাব তেলাওয়াত করে। হাসান বিন আলী (রাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তীগণ আল-কুরআনকে তাঁদের রবের পক্ষ থেকে পত্রাদি ভেবেছিলেন। ফলে তাঁরা রাতের বেলায় এগুলোকে গভীর মনোনিবেশ সহকারে তেলাওয়াত করতেন আর দিনের বেলায় এর অন্তর্নিহিত অর্থ তালাশ করতেন। ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের তেলাওয়াতকারীকে ভেবে দেখা উচিত, আল্লাহ তা'আলা কতই না করুণা প্রদর্শন করেছেন যে তিনি তাঁর কালামকে মানুষের বোধগম্য করে দিয়েছেন। আর তার এটাও জানা উচিত যে সে যা তেলাওয়াত করছে তা কোন মানুষের উক্তি নয়। সে তার অন্তরে কথক আল্লাহ তা'আলার মহানত্বকে উপস্থিত করে তাঁর কালামকে গভীর মনোনিবেশ সহকারে তেলাওয়াত করবে। আললাহ

ইমাম নবভী (রহঃ) বলেন, তেলাওয়াতকারীর সর্ব প্রথম দায়িত্ব হলো সে তাঁর অন্তরকে এভাবে জাগ্রত করবে যে, সে আল্লাহর সাথে কথোপকথন করছে। এ কারণেই রাসূল (সাঃ)-এর একজন সাহাবী একটি সূরাকে তেলাওয়াত করে, সূরাটির অর্থ গভীরভাবে মনোনিবেশ করে এবং সূরাটিকে মহব্বত করে আল্লাহর মহব্বত অর্জন করতে সক্ষম হন। ঐ সূরাটি হল করুনাময়ের গুণ সম্বলিত 'সূরা এখলাস'। সেই সাহাবী নামাযে সূরাটি বারবার পড়তেন। যখন তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হল তখন তিনি বলেন, এ সূরাটি করুণাময়ের গুণ সম্বলিত, তাই আমি এটা পড়তে ভালবাসি। অতঃপর রাসূল (সাঃ) বললেন, *'তোমরা তাকে খবর দাও নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁকে ভালবাসবেন'* (বুখারী)। আমাদের জানা দরকার যে, নিশ্চয়ই তেলাওয়াতের উদ্দেশ্য হলো আয়াতের দিকে গভীরভাবে মনোনিবেশ করার লক্ষ্যে আয়াতটি বারবার পড়ার প্রয়োজন হলে পড়তে হবে। যেমন, রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ এরূপ

করেছেন। হযরত আবু যার (রাঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি একরাত একটি আয়াতকে বারবার তেলাওয়াত করে কাটিয়েছেন। (আয়াতটি হলো)

অর্থাৎ, "যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার বান্দা এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ।" (সূরা মায়েদা ৫ঃ ১১৮)

একদা তামীম আদদারীর (রাঃ) একটি আয়াত বারবার তেলাওয়াত করেন। (আয়াতটি হলো)

অর্থাৎ, "যারা দুষ্কর্ম উপার্জন করেছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সে লোকদের মত করে দেব যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং তাদের জীবন ও মৃত্যু কি সমান হবে? তারা যা ফয়সালা করে তা কতইনা মন্দ।" (সূরা জাসিয়াঃ২১)

দুইঃ ফরয কাজগুলো আদায়ের সাথে সাথে নফল কার্যাবলীর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা। কেননা নফল কাজগুলো বান্দাহকে আল্লাহর মহব্বত এর স্তর থেকে আল্লাহর মাহবুব তথা প্রিয়জনের স্তরে পৌছিয়ে দেয়। রাসূল (সাঃ) মহান রব এর পক্ষ থেকে হাদীসে কুদসীতে বলেন, *'যে আমার ওলীর (বন্ধুর) সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা দিয়ে থাকি। আমার বান্দা তাঁর উপর ফরযকৃত কার্যাবলী ভিন্ন অন্য কাজ দিয়ে আমার ভালবাসা অর্জন করতে পারে না। (অর্থাৎ আল্লাহর মহব্বত হাসিলের প্রধান উপায়ে হল ফরয কার্যাবলী) আর আমার বান্দা নফল কার্যাবলীর মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভে সচেষ্ট থাকে শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ভালবাসি থাকি। অতঃপর আমি যখন তাকে ভালবাসি তখন আমি তাঁর কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শুনে, আমি তাঁর চক্ষু হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, আমি তাঁর হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে কিছু ধরে, আমি তাঁর পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে চলে (অর্থাৎ এসব অঙ্গগুলো আমার আদেশের অনুগত হয়ে কাজ সম্পাদন করে)।*

আর সে আমার কাছে সওয়াল করলে আমি অবশ্যই তা দিয়ে দেই। আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় প্রদান করি।' (বুখারী)

উক্ত হাদীসে সফলকাম মুক্তিপ্রাপ্ত দু'ধরনের লোকের কথা সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। এক ধরনের লোক হলো আল্লাহকে মহব্বতকারী, আল্লাহর ফরয কার্যাবলী যথাযথ আদায়কারী এবং আল্লাহর সীমানায় অবস্থানকারী মু'মিনের দল। আর দ্বিতীয় ধরনের লোক হলো আল্লাহর মাহবুব তথা প্রিয় বান্দাদের দল যারা ফরয কার্যাবলী যথাযথভাবে আদায় করে নফল কার্যাবলী মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আর ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম স্বীয় উক্তি, 'নিশ্চয়ই ইহা অর্থাৎ নফল কাজগুলো বান্দাহকে আল্লাহর মহব্বত এর স্তর হতে আল্লাহর মাহবুব এর স্তরে পৌছিয়ে দেয়'-এ উক্তি দিয়ে এটিই বুঝিয়েছেন। ইবনে রজব আল হাম্বালী (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহর প্রথম দলের কথা উল্লেখ করত, দ্বিতীয় দলের পরিচিতিতে বলেন তারা ফরয কাজ গুলো যথাযথ সমাধা করে নফল কাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করেন। ফলে তারা অগ্রগামী নৈকট্যশীল পদমর্যাদার অধিকারী হন। কেননা তারা ফরয কাজগুলো আদায় করে নফল কার্যাবলীতে প্রানান্তকর প্রচেষ্টার মাধ্যমে আনুগত্য প্রকাশ করে আর তাকওয়ার ফলশ্রুতিতে অপছন্দনীয় কাজ থেকে নিজদেরকে বিরত রেখে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করে থাকে। আর এ ধরনের প্রচেষ্টা বান্দার জন্য আল্লাহর মহব্বতকে অবধারিত করে দেয়। যেমন হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, *'আমার বান্দা সর্বদা নফল কাজগুলো দিয়ে আমার নৈকট্য হাসিলে সচেষ্ট থাকে। পরিশেষে আমি তাঁকে মহব্বত করি।"* ফলে যাকে আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসেন তাকে তিনি তাঁর ভালবাসার ও তাঁকে আনুগত্য করার ক্ষমতা ও শক্তি প্রদান করেন। আর আল্লাহর কাছে এ ধরনের বান্দার বিশেষ মর্যাদা লাভ হয়। নফল কার্যাবলী যে গুলোর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল হয় তা অনেক প্রকার। আর এ গুলো ফরয যেমন নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ্ব ও উমরা এর অতিরিক্ত কার্যাবলী।

তিনঃ সর্বাবস্থায় ও সার্বক্ষণিক জিহ্বা, অন্তর, কাজ এবং অবস্থার মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করা। তাই যিকিরের পরিমান অনুযায়ী বান্দাহ আল্লাহর মহব্বতের অংশীদার হবে।

রাসূল (সাঃ) বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বলেন, যতক্ষণ বান্দাহ আমার যিকির করে এবং আমার স্মরণে তাঁর ঠোটদ্বয় নড়াচড়া করে ততক্ষণ আমি বান্দার সাথে থাকি।' (আলবানীর সহীহ ইবনে মাজাহ) আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমি তোমাদের স্মরণ করব।' আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, *'নিশ্চয় "আলমুফরিদুন" তথা অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ কারা? তিনি বললেন আল্লাহর অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও মহিলাগণ।'* (সহীহ মুসলিম) যে আল্লাহর যিকির করে না রাসূল (সাঃ) তাঁর ধ্বংসের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, *"কোন জনগোষ্ঠি কোথাও বসে যদি আল্লাহর স্মরণ না করে আর নবীর উপর সালাত প্রেরণ না করে তাহলে এটা তাদের জন্য কিয়ামত দিবসে আক্ষেপের কারণ হবে। যদিও তারা পুরস্কার স্বরূপ জান্নাতে প্রবেশ করে।"* হাদীসটিকে আহমদ শাকির সহীহ বলে আখ্যায়িত বলেন, *'যখন কোন সম্প্রদায় কোন মজলিস থেকে এমতাবস্থায় উঠে যে তারা এ মজলিসে আল্লাহর যিকির করেনি তখন তারা যেন মৃত গাধার দুর্গন্ধ থেকে উঠে থাকে এবং তাদের জন্য আক্ষেপ হবে।'* (আলবানীর সহীহ সুনানে আবী দাউদ।) তাই *এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর কাছে এসে যখন বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই ইসলামের বিধিবিধানগুলো আমাদের উপর আধিক্যতা লাভ করেছে। তাই আমাদের এমন এক ব্যাপক বিষয় শিক্ষা দিন যা আমরা আঁকড়ে ধরব। উত্তরে তিনি বললেন, 'তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর স্মরণে আপ্লুত থাকে।'* (আলবানীর সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ)। নিশ্চয়ই সাহাবীগণ উক্ত অছিয়তটুকু বুঝেছিলেন এবং এর মূল্যবান অর্থ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এমন কি হযরত

আবুদ দারদা (রাঃ) কে যখন বলা হল যে, *এক ব্যক্তি একশত জন লোক আযাদ করতে একজন ব্যক্তির বিপুল অর্থ ব্যয় হয়েছে। এর চেয়ে অধিক উত্তম কাজ হলো দিবারাত্র ঈমানের সাথে লেগে থাকা আর সর্বদা তোমাদের কারো জিহ্বা আল্লাহর স্মরণে আপ্লুত থাকে।* হাদীসটি ইমাম আহমদ 'যুহুদ' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। আবুদ দারদা (রাঃ) আরো বলতেন, *যাদের জিহ্বা সর্বদা আল্লাহর যিকিরে আপুত থাকে তারা জান্নাতে হাসতে হাসতে প্রবেশ করবে।*

চারঃ কুপ্রবৃত্তির অত্যাধিক তাড়নার সময় নিজের প্রবৃত্তির উপর আল্লাহর মহব্বতকে অগ্রাধিকার দেয়া। যদিও আল্লাহ্র মহব্বত লাভ কষ্ট সাধ্য ব্যাপার তা সত্ত্বেও তাঁর সহব্বত লাভে উদ্যোগী হওয়া। ইবনুল কাইয়্যিম উক্ত বাক্যের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টিকে আল্লাহ ভিন্ন অন্যের সন্তুষ্টির উপর অগ্রাধিকার দেয়া যদিও এ পথে চলতে বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয় অথবা ভারী কষ্ট স্বীকার করতে হয় অথবা শক্তি সামর্থের অপ্রতুলতা পরিলক্ষিত হয়। তিনি আরো বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টিকে আল্লাহ ভিন্ন অন্যের উপর অগ্রাধিকার দেয়া মানে বান্দাহ এমন ইচ্ছা করবে, এমন কাজ করবে যার মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি আনয়ন করে। আর এটাই হলো আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকারের নমুনা আর এ অগ্রাধিকারের সর্বোচ্চ স্তরে ছিলেন আল্লাহর রাসূলগণ আর বিশেষভাবে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সবকিছুর উপর অগ্রাধিকার দেয়ার ক্ষমতা শুধুমাত্র তিনটি উপায় লাভ হতে পারে (১) কু-প্রবৃত্তির তাড়নাকে দমিয়ে রাখা; (২) কু-প্রবৃত্তির বিরোধিতা করা; (৩) শয়তান ও তার দোসরদের সাথে সংগ্রাম করা।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, মুসলমানের উচিত সে আল্লাহকে ভয় করবে আর কুপ্রবৃত্তি থেকে নফসকে নিষেধ করবে। শুধুমাত্র প্রবৃত্তি ও লালসার জন্য শাস্তি দেয়া হয় না বরং প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং এর চাহিদার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেই শাস্তি বর্তায়। তাই কোন নফস, যখন কোন খারাপ ইচ্ছা করে আর ব্যক্তিটি নিজের নফসকে খারাপ থেকে নিষেধ করে তখন এ নিষেধটি আল্লাহর ইবাদত ও সওয়াবের কাজে পরিনত হয়। (মাউমুউল ফাতাওয়া ৬৩৫/১০)

পাচঃ আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলীকে অন্তকরণ দিয়ে অনুধাবন করা, এগুলোকে ভালভাবে অবলোকন করা এবং উত্তম ভাবে জানা। আর এ জ্ঞানের বাগানসমূহে অন্তর দিয়ে বিচরণ করা। তাই যে আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর নামাবলী, গুণাবলী ও কার্যাবলী সহ জানতে পারে সে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালবাসবে। ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন, কাউকে জ্ঞানী বলে আখ্যায়িত করা যাবে না যতক্ষণ না সে আল্লাহকে জানবে আর এ পথের সন্ধান পাবে যে পথ তাকে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। আরও সে জানবে এ পথে চলার বিপদাপদ ও বাধা সমূহ। ফলে তার মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যা তার এ জ্ঞানের সাক্ষ্য বহন করবে। তাই আসল জ্ঞানী সেই যে আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর নামাবলী, গুণাবলী ও কার্যাবলী সহ জানে অতঃপর তার কাজকর্মে আল্লাহকে সত্য প্রমাণিত করে তার নিয়ত ও ইচ্ছাকে একমাত্র আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করে।

যে আল্লাহর গুণাবলী অস্বীকার করল সে নিশ্চিতভাবে ইসলাম ও ঈমানের ভিত্তিমূল ভেঙে দিল এবং ইহ্সানের বৃক্ষটি ধ্বংস করে দিল। এ ধরনের লোক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী তো হতেই পারে না। আর যে আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর অপব্যাখ্যা করল সে যে রাসূল (সাঃ)-এর পূর্ণাঙ্গ রেসালাতের উপর অপূর্ণঙ্গ ও ত্রুটির অপবাদ আরোপ করল। কেন না এটা অসম্ভব যে রাসূল (সাঃ) ঈমানের অধ্যায়সমূহের মধ্যে অত্যাধিক গুরুত্ব পূর্ণ অধ্যায় ছেড়ে দেবেন অথচ এটার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন অন্যটির চেয়ে অত্যাধিক। রাসূল (সাঃ) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, *তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে যে কেউ ঐ নামগুলো মুখস্থ করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল।"*

ছয়ঃ আল্লাহর অবদান অনুদানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দেয়া তাঁর অগণিত বাহ্যিক ও গুপ্ত নেয়ামত ও করুণাকে অবলোকন করা। আর এ ধরনের গভীর মনোনিবেশ বান্দাহকে আল্লাহকে মহব্বতের দিকে সাড়া প্রদান করে।

বান্দা অনুদানের বন্দী। তাই নেয়ামত, করুণা ও অনুদান এমন মহৎগুণ যা মানুষের আবেগকে বন্দী করে ফেলে, মানুষের অনুভূতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে এবং বান্দাহকে ঐ সত্ত্বার ভালবাসার দিকে ধাবিত করে যিনি তার প্রতি করুণা করেছেন এবং তাকে কল্যানের পথ প্রদর্শন করেছেন। প্রকৃত পক্ষে পুরস্কার দানকারী এবং কল্যাণ ও ইহ্সান প্রদানকারী এক আল্লাহ ছাড়া আর কেহ নন। প্রকাশ্য বুদ্ধিমত্ত্বা আর সহীহ রেওয়ায়াতেই এর যথার্থ সাক্ষ্যবহন করে। তাই চক্ষুস্মানদের কাছে বাস্তব ক্ষেত্রে মাহবুব আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ নন। সকল প্রকার মহব্বতের হকদার তিনি ভিন্ন অন্য কেহ নন।

মানুষ প্রকৃতিগত ভাবে তাকে ভালবাসে যে তাঁর প্রতি ইহ্সান করে। তার সাহায্যে এগিয়ে আসে, তার শত্রুদের প্রতিহত করে এবং তাঁর সকল উদ্দেশ্য লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে। মানুষ যখন গভীর ভাবে চিন্তা করবে তখন সে জানতে পারবে যে তাঁর প্রতি ইহ্সানকারী হচ্ছেন এককভাবে আল্লাহ তা'আলা। গুনে গুনে তাঁর ইহ্সান ও দয়াগুলোর সংখ্যা নির্ধারণ করা যাবে না। আল্লাহ্ বলেনঃ

"যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনাকর তবে গুনে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী ও অকৃতজ্ঞ।" (সূরা ইব্রাহীম ১৪ঃ ৩৪)

সাতঃ এটি অন্য সব উপায় সমূহের মধ্যে অত্যাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। অন্তরকে পুরোপুরিভাবে আল্লাহর সামনে তুচ্ছ করে দেয়া।

তুচ্ছ করা মানে নিজকে ছোট করে দেয়া, হেয় করে দেয়া ও অবনত করা। আল্লাহ বলেনঃ

"দয়াময় আল্লাহর ভয়ে সবশব্দ ক্ষীণ হয়ে যাবে। সুতরাং মৃদুগুঞ্জন ব্যতীত তুমি কিছুই শুনবে না।" (সূরা ত্বাহা ২০ঃ ১০৮)

আর রাগীব ইস্পাহানী (রহঃ) বলেন, আয়াতে উল্লোখিত 'আল খুশু' মানে ক্ষীণ হয়ে যাওয়া। অধিকাংশ স্তরে 'খুশু' শব্দটি অঙ্গপ্রতঙ্গের ক্ষেত্রে এবং 'দ্বরাআহ' শব্দটি অন্তকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তাই বলা হয়, যখন অন্তর তুচ্ছ হয়ে যায় তখন স্বভাবতই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো ক্ষীণ হয়ে যায়। ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, আসলে 'খুশু' হচ্ছে সম্মান, মহব্বত, তুচ্ছ ও ক্ষীণ সম্বলিত ভাবধারার সমষ্টি।

আমাদের পূর্ববর্তীদের জীবন চরিত্রে আল্লাহর সামনে খুশুর আশ্চর্য্য অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। যা তাদের স্বচ্ছ ও পূতঃ অন্তরের সাক্ষ্য বহন করে। *হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন তাঁকে খুশুর কারণে নির্জিব কাঠ মনে করা হত। তিনি যখন সেজদা দিতেন তখন চড়ুই পাখি তাঁর পিঠের উপর দেয়ালের কাঠ খন্ড মনে করে বসে যেত। হযরত আলী বিন হুসাইন (রাঃ) যখন অযু করতেন তখন তাঁর রঙ হলুদ বর্ণের হয়ে যেত। তাঁকে যখন বলা হল কি কারণে আপনাকে অযুর সময় এরূপ হতে দেখা যায়? তিনি বলেন, তোমরা কি জান আমি কার সামনে দাঁড়াইতে ইচ্ছা করছি।*

আটঃ আল্লাহ তা'আলা যখন (দুনিয়ার আকাশে) আগমন করেন তখন তার সাথে মোনাযাত ও তাঁর কালাম তেলাওয়াত করার নিমিত্তে তার সাথে একাকিত্ব গ্রহণ করা। অন্তর দিয়ে আল্লাহকে বুঝা এবং তার সামনে বান্দাহ সুলভ আদব নিয়ে আচরণ করা অতঃপর তওবা ইস্তেগফারের মাধ্যমে এর ইতিটানা। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

"তাদের পার্শ্ব-শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তাদেরকে পালনকর্তা যে রিযিক দিয়েছ তা থেকে তারা ব্যয় করে।" (সূরা সিজদাহ ৩২ঃ ১৬)

নিশ্চয়ই রাতে ইবাদতকারীরা নিঃসন্দেহে আল্লাহর মহব্বতের অধিকারী বরং তারা মহব্বতের অধিকারীদের মধ্যে সেরা। কেননা রাতের বেলায় আল্লাহর সামনে তাদের দাঁড়ানোর মাধ্যমে উপরোল্লিখিত মহব্বতের প্রধান কারণসমূহ তাদের মাঝে সমবেত হয়ে থাকে। এজন্য এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে আকাশের আমীন জিব্রাইল (আঃ) যমীনের আমীন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে নাযিল হয়ে বলেন, *জেনে রেখো মুমিনের মর্যাদা তার রাতে দাড়িয়ে ইবাদত করার মাঝে আর তার ইজ্জত ও সম্মান হচ্ছে মানুষ থেকে নিজকে মুখাপেক্ষীহীন রাখার মধ্যে।* (সিলসিলাতুছ সহীহা)

হাসান বাসরী (রহঃ) বলতেন, 'গভীর রাতে নামায পড়ার চেয়ে অধিক কষ্টকর কোন ইবাদত আমি পাই নি। অতঃপর তাকে বলা হল মুজতাহিদগণ মানুষের মধ্যে সুন্দর চেহারার অধিকারী হওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন, 'কেননা তারা পরম করুণাময়ের সাথে একাকী মিলিত হয়। তাই তিনি তাদেরকে তার নূরের লেবাস পরিয়ে দেন।'

নয়ঃ সত্যিকারভাবে যারা আল্লাহ্ কে ভালবাসে তাদের সাহচর্যতা অবলম্বন করা, তাদের ফল সংগ্রহ করা হয়। আর যখন তোমার কথা বলার উপকারিতা প্রাধান্য পাবে, আর তুমি জানতে পারবে যে এ বলার মধ্যে তোমার অবস্থার উন্নতি হাসিল হবে এবং অন্যকে ফায়দা পৌঁছাতে পারবে।

রাসূল (সাঃ) বলেন, *'আল্লাহ ইরশাদ করেন আমার উদ্দেশ্যে পরস্পর মহব্বতকারীদের জন্য আমার মহব্বত অবধারিত হয়ে যায়। আমার উদ্দেশ্যে পরস্পর বৈঠককারীদের জন্য, আমার মহব্বত অবধারিত হয়ে যায়। আমার উদ্দেশ্যে পরস্পর সাক্ষাৎকারীদের জন্য ও আমার মহব্বত অবধারিত হয়ে যায়।'* শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (মিশকাতুল মাছাবীহ) রাসূল (সাঃ) বলেন, *'ঈমানের সবচেয়ে মযবুত রশ্মি হলো তুমি ভালবাসবে আল্লাহর জন্য আর তুমি শত্রুতা পোষণ করেন আল্লাহর জন্য।'* (সিলসিলাতুছ সহীহা ৭২৮) তাই কোন মুসলমানের আল্লাহর উদ্দেশ্যে তার ভাইকে মহব্বত করাই হচ্ছে তার সঠিক ঈমান ও উন্নত চরিত্রের ফল। ইহা একটি মযবুত বন্ধন। এর মাধ্যমে আলস্নাহ তার বান্দার অন্তরকে হেফাযত করেন এবং তার ঈমানকে এমনভাবে মযবুত করেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তার বান্দার অন্তরকে হেফাযত করেন এবং তার ঈমানকে এমনভাবে মযবুত করেন, যাতে সে আর হারিয়ে না যায় অথবা দুর্বল না হয়ে পড়ে।

দশঃ ঐ সকল কারণ থেকে দূরে থাকা যে গুলো আল্লাহ ও তাঁর বান্দার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেয়। তাই অন্তর যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন ব্যক্তিটি তার দুনিয়ার কার্যাবলী তে যা ভাল করে তাতে কোন ফায়দা পায় না, আর পরকালে তো কোন কল্যাণ অথবা কোন অর্জনের ভাগী হয় না। আল্লাহ বলেনঃ 'সে দিন সম্পদ ও সন্তানাদি কোন ফায়দা দেবে না।' (সূরা শুয়ারা ২৬ঃ ৮৮)